পঞ্চদশ অধ্যায়

ইতিহাসের ইঙ্গিত

ইতিহাসের যুক্তি দিয়া এই গ্রন্থের সূচনা; সেই যুক্তিকেই বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি পর পর তেরোটি অধ্যায় জুড়িয়া। এই সুবিস্তৃত তথ্যবিবৃতি ও আলোচনার ভিতর হইতে ইতিহাসের কোন্ কোন্ ধারা সরু মোটা রেখায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, নিরবচ্ছিন্ন সমগ্র প্রবাহটির কোথায় কোন্ বাঁক দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এই সুবিস্তৃত কালখণ্ড পরবর্তী কালখণ্ডের জন্য কী কী বস্তু উত্তরাধিকার স্বরূপ রাখিয়া যাইতেছে, ভবিষ্যতের কোন্ নির্দেশ দিয়া যাইতেছে, এক কথায় এই সুবৃহৎ গ্রন্থ ভেদ করিয়া ইতিহাসের কোন্ ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিতেছে, গ্রন্থশেষে একটি অধ্যায়ে তাহার আলোচনা উপস্থিত করা হয়তো অসঙ্গত নয়। এতক্ষণ ছিলাম ঘনবৃক্ষবিন্যস্ত গহন অরণ্যের মধ্যে; এখন দূরে দাঁড়াইয়া বাহির হইতে সমস্ত অরণ্যটির আকৃতি-প্রকৃতি এবং উহার সমগ্র জীবন-প্রবাহের ধারাটি সংক্ষেপে একটু ধরিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এই চেষ্টার উদ্দেশ্য প্রাচীন বাঙালীর জীবন-প্রবাহের উপরিভাগের ছোটবড় তরঙ্গগুলির পরিচয় লওয়া নয়; সে কাজ তো সুদীর্ঘ গ্রন্থ জুড়িয়াই করিয়াছি। বরং আমার উদ্দেশ্যে, সেই প্রবাহের গভীরে কোন্ আবর্ত ঘূর্ণ্যমান, কোন অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্রোতের সঞ্চরণ, কোন্ কোন্ শক্তি সক্রিয় তাহা জানা ও বুঝা, সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ ও বস্তুপুঞ্জকে সংহত করিয়া একটি গভীর ও সমগ্র দৃষ্টিতে দেখা, প্রাচীন বাঙালী জীবনের মৌলিক ও গভীর চরিত্রটিকে ধরিতে চেষ্টা করা। এই জানা ও বুঝা, দেখা ও ধরা ঐতিহাসিকের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

এই গ্রন্থের যুক্তিপর্যায় অনুসরণ করিয়াই একে একে তাহা করা যাইতে পারে। কিন্তু আলোচ্য প্রসঙ্গে আমি আর কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করিব না, করিবার প্রয়োজনও নাই, কারণ সে-সব সাক্ষ্যপ্রমাণ এই গ্রন্থের পূর্বোক্ত তেরোটি অধ্যায়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। আমার মন্তব্যগুলি প্রায় সমস্তই প্রত্যক্ষভাবে সে-সব সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, তবে কিছু কিছু এমন মন্তব্যও আছে যাহা শুধু সাক্ষ্য প্রমাণের পরোক্ষ ইঙ্গিত অথবা যাহা অনুমানসিদ্ধ মাত্র। ইতিহাসে এই ধরনের ইঙ্গিত বা অনুমানের স্থান নাই, এমন বলা চলে না।

কৌম চেতনা

আজ আমরা যাহাদের বাঙালী বলিয়া জানি তাহারা সকলেই একই নরগোষ্ঠীর লোক নহেন, এ-তথ্য সর্বজনবিদিত; বিচিত্র নরগোষ্ঠীর লোক লইয়া বৃহত্তর বাঙালী জনের গঠন। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, বাঙলাদেশে বহুদিন পর্যন্ত ইহাদের অধিকাংশই ছিল কোমবদ্ধ গোষ্ঠীবদ্ধ জন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইহারা একান্ত

কৌমজীবনেই অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। এক একটি কোম এক একটি বিশিষ্ট স্থান লইয়া মোটামুটি ভাবে স্ব-স্বতন্ত্রপরায়ণ স্ব-সম্পূর্ণ জীবন যাপন করিত, অন্য কোমের সঙ্গে যোগাযোগ বড় একটা থাকিত না, বিধিনিষেধের বাধাও ছিল নানা প্রকারের। তাহার ফলে এই সব বিচিত্র কোমের মধ্যে বৃহত্তর জনচেতনা বলিয়া কিছু গড়িয়া উঠিবার সুযোগ বিশেষ ছিল না, সমাজগঠনে তাহার প্রভাব তো দূরের কথা। পরবর্তী কালে সভ্যতা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, নানাপ্রকারের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের ফলে এই সব বিচিত্র কোমের মধ্যে নানাপ্রকারের আদান-প্রদান চলিতে থাকে, এবং তাহারই ফলে বৃহত্তর অঞ্চলকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ কোমের একত্র সমবায়ে বৃহত্তর কোমের (বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ, পুণ্ড্রাঃ, সুহ্মাঃ ইত্যাদির) উদ্ভব ঘটে। কিন্তু বৃহত্তর কোম বা এই সব জন গড়িয়া ওঠার পরও কৌমসত্তা ও কৌমস্মৃতি কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসে এই কৌমচেতনা পূর্বাপর সর্বত্র সক্রিয়; সমাজের বর্ণ, বৃত্তি ও শ্রেণী-বিন্যাসে, অর্থ উৎপাদন ও বণ্টনে, গ্রাম ও নগরের বিভিন্ন পল্লীর বিন্যাসে, রাষ্ট্রগত ক্রিয়াকর্মে, এমন কি যুদ্ধবিগ্রহে, ধর্মকর্মে, এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই কৌমচেতনার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ কোম এবং গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের সমস্ত ভাবনা-কল্পনা, সমস্ত ক্রিয়াকর্ম আবর্তিত হইত। অন্তত, প্রাচীন বাঙলার শেষ পর্যন্ত এই কৌমচেতনা সমভাবে বিদ্যমান, এমন কি মধ্যযুগেও। এখনও তাহা নাই এমন বলা চলে না। বস্তুত, বাঙলাদেশের ইতিহাসের গভীরে তাকাইয়া যদি বলা যায়, এই কৌমস্মৃতি ও কৌমচেতনা আজও বহমান তাহা হইলেও খুব অন্যায় বলা হয় না।

আঞ্চলিক চেতনা

কৌমস্মৃতি ও কৌমচেতনার সঙ্গে প্রায় অঙ্গাঙ্গী জড়িত আঞ্চলিক স্মৃতি ও আঞ্চলিক চেতনা। রাঢ়াঃ, সুহ্মাঃ, গৌড়াঃ, পুণ্ড্রাঃ প্রভৃতি যে-সব জনদের কথা সাহিত্যে ও লিপিমালায় পড়িতেছি, সে-সব জনেরাও তো এক একটি অঞ্চলকে আশ্রয় করিয়া ক্রমশ রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে এই সব পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র বৃহৎ জনপদকে একটি বৃহত্তর প্রান্ত বা দেশখণ্ডে একত্র ও সমন্বিত করিয়া তাহাকে একটা সমগ্র রূপ দিবার সজাগ চেষ্টা অন্তত শশাঙ্কর সময় হইতেই দেখা দিয়াছিল এবং পাল-পর্বে পাল-সম্রাটেরা ও পরবর্তী কালে সেন-রাজারাও এ-সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাধারণভাবে প্রান্ত বা দেশের সামগ্রিক ঐক্যচেতনা জনসাধারণের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, অন্তত প্রাচীন বাঙলায় তেমন প্রমাণ বিশেষ নাই। পাল ও সেন-বংশের রাজারা যখন গৌড়েশ্বর বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন তখনও সাহিত্যে ও লিপিমালায়, তথা জনসাধারণের চিত্তে যে সব স্মৃতি ও চেতনা সক্রিয় তাহা বিশিষ্ট জনাশ্রিত বিশেষ বিশেষ জনপদের— রাঢ়ের, পুণ্ড্রের, সুহ্মের, বরেন্দ্রের, বঙ্গের, হরিকেলের, সমতটের। বস্তুত, প্রাচীন বাঙালী নিজেদের আঞ্চলিক জনপদ সত্তাকে বৃহত্তর দেশ বা প্রান্তসত্তায় মিশাইয়া দিতে বা দু'য়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করিতে শেখে নাই। আজও যে তাহা খুব সহজ হইয়াছে, এমন বলা চলে না। বস্তুত স্থানীয় আঞ্চলিক সত্তা ও বৃহত্তর দেশসত্তার বিরোধ শুধু যে বাঙলার ইতিহাসেই সক্রিয় এমন নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের বৃহত্তর ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তাহাই, এবং কোনও কোনও ঐতিহাসিক ইতিপূর্বেই তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। একদিকে আমাদের চিন্তানায়ক, ধর্মগুরু এবং রাষ্ট্রবিধাতাদের কেহ কেহ সর্বভারতীয় চেতনাবোধটিকে সদাজাগ্রত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, নানা উপায়ে; অন্যদিক ইঁহাদেরই অনেকে আবার আমাদের আঞ্চলিক সংকীর্ণ বুদ্ধিটিতে নানাভাবে পরিতুষ্ট ও পরিপোষণ করিয়াছেন। আমাদের ধর্ম ও অধ্যাত্ম-জীবনে একদিকে যেমন ঐক্য ও সাম্যের জয়গান তেমনই অন্যদিকে আবার নানা ভেদ বৈষম্যের এবং

অনৈক্যের সৃষ্টি। যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসে আঞ্চলিক চেতনা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, এবং এই চেতনার ফলেই সেই ইতিহাসে দেশের বা প্রান্তের সামগ্রিক বোধ কোনও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এই আঞ্চলিক চেতনাই শশাঙ্ক বা পাল ও সেনরাজাদের চেষ্টাকে পরিণামে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল।

পূর্বোক্ত-কৌমচেতনা ও সদ্যোক্ত আঞ্চলিক চেতনা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে প্রধানত দুইটি কারণে— একটি কারণ ধনোৎপাদনপদ্ধতিগত, আর একটি রাষ্ট্রবিন্যাসগত।

এই দুই চেতনার পুষ্টির কারণ : ভূমিনির্ভর কৃষিজীবন

প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের একেবারে আদিতে সামাজিক ধনের প্রধান উৎস ছিল শিকার, কৌম কৃষি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্প। দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ মোটামুটি খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-দ্বিতীয়-প্রথম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত উন্নতপ্রণালীর কৃষি এবং গৃহশিল্প অর্থোৎপাদনের বড় উপায় ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রধানতম উপায় ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। কিন্তু শেষ পর্যায়ে, অর্থাৎ অষ্টম শতক হইতে আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত বাঙালী জীবন একান্তই ভূমি ও কৃষিনির্ভর। মোটামুটি ভাবে বলা চলে, স্বল্প কয়েকটি শতাব্দী ছাড়া বাঙলাদেশের ঐকান্তিক কৃষি ও ভূমি-নির্ভরতা কখনও ঘুচে নাই। ভূমি স্থির ও অবিচল, এবং সেই ভূমিকে আশ্রয় করিয়া যাঁহাদের জীবন ও জীবিকা তাঁহারা ভূমির অঞ্চলটিকে এবং সেই অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীকে আঁকড়াইয়া থাকিবেন, উহাদের কেন্দ্র করিয়াই তাঁহাদের ভাবনা-কল্পনা আবর্তিত হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। অপরপক্ষে শিল্প ও ব্যাবসা-বাণিজ্যনির্ভর জীবনে ভূমির প্রতি আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত শিথিল। ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে বণিক, সার্থবাহ, সদাগরদের দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত; তখনকার দিনে এক একবার ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইত দূরদেশে, দেশান্তরে; গৃহের, পরিবারের, কোম ও গোষ্ঠীর বন্ধন স্বতই হইয়া পড়িত শিথিল, গ্রামের ও অঞ্চলের বন্ধন হইত শিথিলতর। কিন্তু গ্রাম্য কৃষিনির্ভর জীবনে হইত তাহার বিপরীত। কাজেই সেই জীবনে পরিবারের, কোমের ও অঞ্চলের চেতনার প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িবার কোনও সুযোগ সম্ভাবনাই ছিল না; বরং তাহা আরও লালিত ও পুষ্ট হইবার সুযোগই ছিল বেশি।

রাষ্ট্রবিন্যাসের ক্ষেত্রে কৌমতন্ত্র ধীরে ধীরে রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হইয়াছিল, এ কথা রাষ্ট্রবিন্যাস অধ্যায়ে বলিয়াছি। কিন্তু এই বিবর্তন বাঙলাদেশের সর্বত্র একই সময়ে একই সঙ্গে হয় নাই। পরাক্রমশালী রাজবংশের প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি কোম ও জন ধীরে ধীরে রাজতন্ত্রের সীমার মধ্যে আসিয়া স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু রাজতন্ত্র গড়িয়া ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের প্রায় অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সামন্ততন্ত্রও গড়িয়া উঠিয়াছিল। একটু বিশ্লেষণেই ধরা পড়িবে, এই সামন্তরা প্রায় সকলেই এক একজন পৃথক পৃথক এক একটি অঞ্চলের কৌম বা জননায়ক, এবং সেই সেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের লোকদের প্রাথমিক আনুগত্য আঞ্চলিক ও কৌমসামন্ত-নায়কটির প্রতি; দেশের বা প্রান্তের রাজা বা সম্রাট তাহাদের কাছে দূরাগত ধ্বনি মাত্র। বাঙলার ইতিহাসের আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিন্যাসের এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাহার ফলে কৌমচেতনা ও আঞ্চলিক চেতনা লালন ও পুষ্টিলাভ করিবে ইহা কিছু বিচিত্র নয়।